উসওয়ায়ে সাহাবা

প্রথম খণ্ড

মাওলানা আবদুস সালাম নদভি রহ.

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
অনূদিত

ইত্তিহাদ

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালিন।

আমাদের জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। পৃথিবীর এ সংক্ষিপ্ততম নীড়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে জান্নাত নামক মহাপুরস্কার লাভ করাই প্রকৃত সফলতা। তবে আমরা জানি না কীভাবে তার হুকুম মানতে হয়।

পৃথিবী নামের গ্রহে আমাদের অবস্থানকে সফল করতে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসুলদের পাঠিয়েছিলেন। তার মাধ্যমে আমাদের দিয়েছেন আসমানি কিতাবসমূহ। নবীর সাহাবিগণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন শরিয়তের বাস্তব প্রয়োগ।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দীনের বিধানাবলি পালনে সাহাবিগণই প্রকৃত মানদণ্ড। তারা যেভাবে দীন পালন করেছেন, সেভাবে পালন করতে পারলেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপানে।

প্রিয় পাঠক, যে মহান মানুষগুলো আমাদের ঈমানের মানদণ্ড, যাদের মতো ঈমান আনতে, যাদের মতো করে দীন পালন করতে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই তাদের সম্পর্কেই যদি আমরা না জানি, কীভাবে তারা দীন অনুযায়ী আমল করেছেন–তার কোনো আলোচনা বা পাঠ যদি আমাদের হাতের নাগালে না থাকে, এর চেয়ে ভয়াবহ শূন্যতা আমাদের জন্য কিছুই হতে পারে না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সেই জানার পথটুকু সহজ করেছেন, এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে বলছি—আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি অনুবাদে যেই দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে, সত্যি বলছি, আমি যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম সোনালি সেই যুগে। বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখুন, আপনিও হারিয়ে যাবেন চৌদ্দশত বছর আগের সেই প্রহরগুলোতে।

ব্যক্তিগত কথা বাড়াব না। গ্রন্থ সম্পর্কেও বেশি কিছু বলব না। শুধু অনুবাদ নিয়ে কিছু কথা বলছি। আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি অনুবাদেও আপনাদেরকে

মৌলিকত্বের স্বাদ দিতে। চেষ্টা করেছি সাবলীলভাবে লেখকের ভাব ও কথন প্রকাশ করতে। অনুবাদের প্রথম দিকে আমার নিকটে পুরোনো সংস্করণ ছিল, পরে নতুন সংস্করণ হাতে এলেও অক্ষরের স্পষ্টতা ছাড়া দুয়ের মধ্যে অ্যাডিশনাল তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি। এজন্য শুরু থেকেই কিছুটা অনুসন্ধিৎসু থাকার চেষ্টা করেছি। কিছু টীকা নিজ থেকেই যুক্ত করেছি। দীর্ঘ হলেও প্রয়োজনীয় কিছু সংলাপ সংযোজন করেছি। ব্যক্তি ও স্থানের নাম, সেই সঙ্গে বর্ণনাগুলোর মূল রেফারেন্সের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস পেয়েছি। অনেক স্থানেই লেখক বা লিপিকারের তাসামুহ ছিল, সেগুলো সংশোধনের ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি। বাকিটুকু আল্লাহ তায়ালা সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে করিয়ে নেবেন, সেই প্রত্যাশা এবং দোয়াই করি।

অনুবাদক হিসেবে কতটুকু সফল হতে পেরেছি, কতটুকু ভুল করেছি; সেই বিচারের ভার (পাঠক) আপনাদের উপর। ভালোটুকু আল্লাহ তায়ালার দান। ভুল যা বিদ্যমান তা আমার সীমাবদ্ধতা। আশা করি পাঠকগণ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। সংশ্লিষ্ট মহলকে জানিয়ে সাদকায়ে জারিয়ার অংশীদার হবেন। আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমিন। ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন!

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
উপজেলা ক্যাম্পাস, লাল বিল্ডিং
বদরগঞ্জ, রংপুর
৩১শে মে, ২০২২ সাল

সাহাবায়ে কেরামের মাজহাব এবং আমাদের করণীয়

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজনের উপর।

পরকথা, আমাদের সিয়ারুস সাহাবার এই সিরিজে সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের এক বিশাল জামাতের জীবনকথা আলোচিত হয়েছে। যাদের সকলেই ছিলেন ইবাদত-মুজাহাদা, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার মতো অসংখ্য মহৎ গুণের অধিকারী। পাশাপাশি কেউ কেউ ইলম ও যোগ্যতায় মুজতাহিদ-স্তরেও পৌঁছে গিয়েছিলেন। তারা সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে ইজতিহাদ করে মাসআলা-মাসাইল উদ্‌ঘাটন করতেন এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। অনেক সাহাবি যেমন এই স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তেমনি বহু তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ি এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

মুজতাহিদ সাহাবিদের মধ্যে আছেন- সাইয়েদুনা আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা, জায়েদ ইবনে সাবেত, আবু মুসা আশআরি, মুয়াজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, আবু দারদা, আবু জর গিফারি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।[১]

এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা রহ. বলেন, '১৩০ এর অধিক সাহাবি ফতোয়া প্রদান করতেন।'[২]

---

[১] ইলামুল মুআক্কিয়িন : ১/১০

[২] ইলামুল মুআক্কিয়িন : ১/১০

তাবেয়িদের মধ্যে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন- হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, উরওয়া ইবনে জুবায়ের, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, খারিজা ইবনে জায়েদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, আবুজ জিনাদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৩]

তাবে-তাবেয়িদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন হজরত লাইস ইবনে সাদ, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওজায়ি, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৪]

তবে যদিও তারা মুজতাহিদ ছিলেন এবং আপন আপন যুগে ফতোয়া প্রদান করতেন, কিন্তু এখন আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য তাদের সেসকল ফতোয়া ও ফিকহি মত সরাসরি অনুসরণ করা জায়েজ নয়। কারণ, তাদের ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত ও ফতোয়াসমূহ আমাদের নিকট সুবিন্যস্তভাবে পৌঁছায়নি। যদি চার মাজহাবের মতো তাদের মাজহাব তথা মত ও ইজতিহাদি সিদ্ধান্তসমূহ সুবিন্যস্তভাবে পৌঁছাত, তাহলে আমরা জানতে পারতাম তাদের ইজতিহাদ ও ফতোয়ার উসুলি ভিত্তি কী ছিল, তা শর্তমুক্ত নাকি শর্তযুক্ত, ওই মতের উপর তারা অটল ছিলেন নাকি পরবর্তীকালে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, ইত্যাদি।

যদি আমরা ফতোয়া প্রদানের প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ করি, তাহলে উপরিউক্ত বিষয়টি সহজে বুঝতে পারব। ইমামগণ ফতোয়া প্রদান করে থাকেন মূলত ইজতিহাদ বা শাস্ত্রীয় গবেষণার ভিত্তিতে। তারা যখন কোনো মাসআলায় মতামত প্রদান করতে চান, তখন ওই বিষয়ক কুরআন-হাদিসের দলিলসমূহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দলিল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দুয়েকটি দলিল তাদের নজর থেকে বাদ যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়; বরং খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সাহাবি-তাবেয়িদের কথা বাদই দিলাম, যদি আমরা প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের ইমামদের প্রতিই লক্ষ করি, তাহলে এর বহু উদাহরণ দেখতে পাব। যেমন, হানাফি মাজহাবের প্রধান ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত হচ্ছে, আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুরা

---

[৩] ইলামুল মুআক্কিয়িন, ১/১৯

[৪] ইলামুল মুআক্কিয়িন, ১/১৯, এখানে আমরা মাত্র কয়েকজন তাবিয়ি ও তাবে-তাবেয়ির নাম উল্লেখ করলাম। ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহ. ইলামুল মুআক্কিয়িনের ১৫-২৩ পৃষ্ঠায় মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, শাম ও ইয়েমেনের ফুকাহায়ে কেরামের এক বিশাল তালিকা উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক তা দেখতে পারেন।

সূচিপত্র

কিছু কথা ২৩
ভূমিকা ৩০
সাহাবির পরিচয় ৩০
সাহাবিদের সংখ্যা ৩৫
সাহাবি চিনব যেভাবে ৩৭
আদালতে সাহাবা ৩৯
সাহাবি-যুগ ৫২
ইসলাম গ্রহণ ৫৩
কুরআনের প্রভাব ৫৪
নবী-চরিত্রের প্রভাব ৫৬
নবীজির উপদেশের প্রভাব ৫৭
নবীজির শামায়েলের (দেহসৌষ্ঠব ও বাহ্যিক আকার-আকৃতি) প্রভাব ৫৭
দাঈদের প্রভাব ৫৮
মুজিজার প্রভাব ৫৮
মক্কাবিজয়ের প্রভাব ৫৯
সাহাবিদের ঈমানি শক্তি ৬০
দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের লোভে ঈমানকে জলাঞ্জলি না দেওয়া ৬০
তারা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছিলেন ৬৩
দীনের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ ৬৬
হিজরত ৭০
সাহাবিদের আকিদা-বিশ্বাস ৭৬
তাওহিদ ৭৬
শিরক থেকে বেঁচে থাকা ৭৭
মূর্তিভাঙা ৭৮
নবুয়তের উপর ঈমান ৮০
অদৃশ্যের প্রতি ঈমান ৮৪

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস ৮৫
সাহাবিদের ইবাদত ৮৭
পবিত্রতা অধ্যায় ৮৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে নতুন করে ওজু ৮৭
সর্বদা ওজুসহ থাকা ৮৭
দৈনিক পাঁচবার মিসওয়াক করা ৮৮
নামাজ অধ্যায় ৮৮
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ৮৮
জুমার নামাজ ৮৯
বিভিন্ন নফল, ইশরাক ও সূর্যগ্রহণের নামাজ ৯০
তাহাজ্জুদ এবং কিয়ামুল লাইল ৯২
নবীজির সাথে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফলে অংশগ্রহণ ৯৪
কিয়ামে রমজান ৯৬
নামাজের সময়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ৯৭
জামাআতের গুরুত্ব ৯৮
নামাজে বিনয়-নম্রতা ১০১
জাকাত অধ্যায় ১০৩
ফরজ জাকাত ১০৩
সদকাতুল ফিতর ১০৪
সাধারণ সদকা ১০৬
মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সদকা ১০৯
আত্মীয়-স্বজনকেও সদকার সম্পদ দেওয়া ১১০
সদকা নিতে চাপপ্রয়োগ ১১১
সদকা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ১১১
গোপনে সদকা করা ১১২
সবচেয়ে উত্তম সম্পদের সদকা ১১৩
সিয়াম অধ্যায় ১১৫
রমজানের রোজা ১১৫
সফরে রোজা ১১৫
আশুরার রোজা ১১৬
দাউদি রোজা ১১৭
সাওমে বিসাল ১১৭

সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা ১১৭
আইয়ামে বিজের রোজা ১১৮
সারা বছর রোজা ১১৮
অন্যান্য নফল রোজা ১১৯
মৃতদের পক্ষ থেকে রোজা ১২০
শিশুদেরকে রোজায় অভ্যস্ত করা ১২০
ইতিকাফ ১২০
হজ অধ্যায় ১২১
হজ ১২১
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ ১২৩
ওমরা ১২৩
কুরবানি ১২৪
জিহাদ অধ্যায় ১২৫
জিহাদের আগ্রহ ১২৫
শাহাদাতের তামান্না ১২৬
জিহাদে একনিষ্ঠতা ১২৮
সাহাবিদের কুরআন অনুযায়ী আমল ১৩১
সুন্নাহর অনুসরণ ১৪৫
শরয়ি বিধি-নিষেধের প্রতি পূর্ণ যত্ন ১৫০
হারাম ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা ১৫০
জাকাত ও সদকা গ্রহণে অনাগ্রহ ১৫২
মুসলমানকে হত্যা থেকে বিরত থাকা ১৫৪
সুদ থেকে নিবৃত্ত থাকা ১৫৫
তারা নেশা থেকে বাঁচতেন ১৫৬
তারা অশ্লীলতা থেকে নিবৃত্ত থাকতেন ১৫৭
তারা গান-বাজনা পরিহার করে চলতেন ১৬০
সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলা ১৬১
বিবিধ ১৬৫
কুরআনের তেলাওয়াত ১৬৫
হিফজুল কুরআন ১৬৮
তাসবিহ-তাহলিল ১৭০
জিকির ১৭১

কেয়ামতের ভয় ১৭১
কবরের শাস্তির ভয় ১৭৫
সাহাবিদের কান্না ১৭৫
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ১৭৭
আল্লাহর জন্য ঘৃণা ১৭৮
পবিত্র স্থানের জিয়ারত ১৭৯
শত কষ্টেও ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালন ১৮১
সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা ১৮২
মানতের গুরুত্ব ১৮৩
রাসুলের সম্মান ছিল তাদের হৃদয়ের গভীরে ১৮৬
রাসুলের বরকতপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ১৮৬
নবীজির স্মৃতির হেফাজত ১৮৯
রাসুলের প্রতি আদব ১৯৩
রাসুলের জন্য উৎসর্গিত সত্তা ২০১
নবীজির খেদমত ২০৬
নবীজির প্রতি ভালোবাসা ২০৯
নবীজির বন্ধুদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা ২১৯
নবীজিকে দেখার তামান্না ২২১
রাসুলের দিদার ২২২
সান্নিধ্যের তামান্না ২২৩
সান্নিধ্যের প্রভাব ২২৫
সাহাবিদের নবী-বরণ ২২৬
মেহমানদারি ২২৮
রাসুল-স্তুতি ২৩০
রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন ২৩২
নবীজিকে হারানোর শোক ২৩৫
রাসুলই ছিলেন তাদের সবকিছু ২৩৭
রাসুলের প্রভাব ২৩৮
রাসুলের আনুগত্য ২৪০
রাসুলের হুকুম পালন ২৪১
নবীজির আহলের সম্মান ২৪৬

সাহাবা-চরিত **২৪৮**
মিসকিনদের সেবা ২৪৮
অমুখাপেক্ষিতা ২৪৯
ত্যাগ ও উৎসর্গ ২৫২
উদারতা ২৫৪
জবানের হেফাজত ২৫৯
অন্যের দোষ গোপন করা ২৬২
প্রতিশোধ না নেওয়া ২৬৩
সহনশীলতা ২৬৪
আতিথেয়তা ২৬৫
আত্মসম্মান ২৬৭
ধৈর্য ও দৃঢ়তা ২৬৭
সাহস ও বীরত্ব ২৭০
অপরাধের স্বীকৃতি ২৭৩
সততা ২৭৫
দীনদারি ২৭৭
নম্রতা ২৮১
দয়া ও ক্ষমা ২৮২
গোত্রপ্রীতি ২৮৪
শুকরে ইলাহি ২৮৫
অমুখাপেক্ষিতা ২৮৬
লজ্জা ও শালীনতা ২৮৮
পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ২৯০
জাগ্রত চিত্ত ২৯২
অঙ্গীকার পূরণ ২৯৫
গোপনীয়তা রক্ষা ২৯৬
প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ২৯৯
আত্মমর্যাদা ৩০০
সামাজিক আচরণ **৩০৩**
আত্মীয়তার বন্ধন ৩০৩
পিতামাতার সঙ্গে সদাচরণ ৩০৫
ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ৩০৮

সন্তানের ভালোবাসা ৩০৯
সন্তানের প্রতিপালন ৩১২
ইয়াতিমদের প্রতি ভালোবাসা ৩১৪
স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ৩১৬
স্বামীর সেবা ৩১৮
স্বামীর সম্পদের হেফাজত ৩১৯
স্বামীর সন্তুষ্টি ৩২১
স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ৩২২
প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ৩২৪
দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ ৩২৫
পারস্পরিক সম্প্রীতি ৩২৯
পারস্পরিক সহযোগিতা ৩৩০
আনন্দ ভাগাভাগি ৩৩২
বন্ধুত্ব ৩৩৪
বড়দের সম্মান ৩৩৫
বন্ধুদের সাক্ষাৎ ৩৩৬
উপহার প্রদান ৩৩৭
অসুস্থের দর্শন ৩৩৭
অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যা ৩৩৮
বিপদে সান্ত্বনা ৩৩৯
সালাম প্রদান ৩৪০
মুসাফাহা ৩৪১
ইহসানের প্রতিদান ৩৪২
কৃতজ্ঞচিত্ত ৩৪২
সুধারণা ৩৪৩
আত্মিক স্বচ্ছতা ৩৪৪
সমবয়সিদের মর্যাদার স্বীকৃতি ৩৪৫
সাম্য ৩৪৬
মর্যাদার কদর ৩৪৯
বিশুদ্ধ লেনদেন ৩৫০
ঋণ পরিশোধে গুরুত্ব ৩৫০
ঋণদাতাকে সুযোগ প্রদান ৩৫৩

ঋণ মওকুফ ৩৫৪
অন্যের হয়ে ঋণ পরিশোধ ৩৫৫
ওসিয়তের পূর্ণতাদান ৩৫৬
নারীদের মোহর প্রদান ৩৫৬
একাধিক স্ত্রীর মাঝে সাম্যের আচরণ ৩৫৭
ক্রয়-বিক্রয়ে ছাড় প্রদান ৩৫৭
উত্তরাধিকার বণ্টনে নিষ্ঠার পরিচয় ৩৫৮
অন্যায় ও ক্রোধ থেকে নিবৃত্তি ৩৫৮
অযথা শপথ পরিহার ৩৫৯
সাহাবিদের জীবনযাপন ৩৬১
দরিদ্রতা ৩৬১
পোশাক-পরিচ্ছদ ৩৬৪
খাদ্য ৩৬৮
ঘর-বাড়ি ৩৬৯
প্রসাধনী ৩৭০
অনাড়ম্বর জীবনযাপন ৩৭১
স্বনির্ভরতা ৩৭৫
জীবনোপকরণ ৩৭৮

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্যই নির্ধারিত। নামাজ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত রাসুলে আরাবির উপর, তার পরিবার ও সাথিদের উপর।

আলোকিত মানবজীবনের জন্য অন্যতম আবশ্যক বিষয় হচ্ছে, চারিত্রিক সংশোধন ও জীবনের উৎকর্ষ সাধন। পৃথিবীতে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি রয়েছে, সবকিছুর উদ্দেশ্য এটাই। অজস্র কাল-পরিক্রমা ও উত্থান-পতনের এই পৃথিবীতে বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রথম মানব সাইয়্যেদুনা আদম আলাইহিস সালামের উপর ন্যস্ত ছিল এ গুরুদায়িত্ব। তৎপরবর্তী যুগে-যুগে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন এ দায়িত্বকে পূর্ণতা দিতে; সর্বশেষ এ মহান দায়িত্বকে উৎকর্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন রাসুলে আরাবির মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং জীবনবিধান হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে চিরদিনের জন্য মনোনীত করলাম।'[১৩]

যদি প্রশ্ন করা হয়, রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন, তার প্রমাণ কী? কীভাবে তিনি বিশ্বমানবতাকে সভ্যতার উৎকর্ষ আসনে আসীন করেছেন?

উত্তরে আমরা তুলে ধরব কিছু নীরব উদাহরণ। তুলে ধরব এমন কিছু পুণ্যময় আত্মার দৃশ্য, যারা আলোকিত হয়েছেন নববি আলোয়; উৎকর্ষিত হয়েছেন নবীজির চেষ্টা, প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ সময়ের সান্নিধ্যে।

আলোকিত এই প্রজন্মটির আবির্ভাবও পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্রাথমিক পর্যায় যখন বিশ্বনবী দীনের দাওয়াত নিয়ে ঘুরেছিলেন

[১৩] সুরা মায়িদা : ০৩

মানুষের দ্বারে-দ্বারে, মরুময় আরবের কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। কিন্তু তিনিও থেমে যাননি। অবশেষে তার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রভাবে কিছুকালের মধ্যেই চারদিক থেকে জড়ো হতে থাকে সত্যান্বেষীদের কাফেলা; যার তুলনা পাওয়া যায় না পূর্ববর্তী কোনো নবীর দাওয়াতি জিন্দেগীতে।

প্রথম দিকে এই কাফেলার সদস্যদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। উত্তরোত্তর এই সংখ্যা বাড়তেই থাকে। হিজরত-পরবর্তী বদরের রণাঙ্গনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায় এই কাফেলার তিনশো তেরোজন সদস্য। মক্কা বিজয়ে এ সংখ্যা পৌঁছায় দশ হাজারে। বিদায় হজে প্রায় এক লাখে এবং রাসুলের ইন্তেকালের সময় এই প্রজন্মের সদস্য সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় লাখের কোটা।

নুহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সময় দীনের দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি।[১৪] ঈসা আলাইহিস সালাম বুকভরা দরদ নিয়ে বলেছিলেন, 'কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে?'[১৫] কিন্তু কয়েকজন হাওয়ারি ছাড়া কেউ তার ডাকে লাব্বাইক বলেনি। অথচ নবীজি যখন বিদায় নেন, আরবের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে পড়েছিল তাওহিদের আলো। সত্যিই, এটা আল্লাহ তায়ালার মহান কারিশমা!

প্রিয় পাঠক, মনে রাখতে হবে, অন্য নবীর তুলনায় আমাদের নবীর সারথির সংখ্যা বেশি, কেবল একটি কারণেই তিনি অন্যদের তুলনায় সেরা নন; বরং তার অনন্য হওয়ার সবচয়ে বড় কারণ হলো, তার থেকে উৎসারিত আলো যাদেরকে আলোকিত করেছে, এখনো তারা সমুজ্জ্বল। দিশাহীন পথে, ঘোর আঁধারে, এখনো তারা পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আকাশের দীপ্ত তারকারাজির মতো।

আমরা যদি নুহ আলাইহিস সালামের মহা প্লাবনের কথা চিন্তা করি, তীহ প্রান্তরে অবস্থানকারী বনি ইসরাইলের কথা ভাবতে বসি; নবীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও তাদের উম্মতের জাতিগত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিদের দিকে তাকালেও আমরা কয়েকজন ছাড়া অন্য কারো তেমন কোনো সাফল্যের কথা ইতিহাসের অলি-গলিতে খুঁজে পাই না। কিন্তু নবী মুহাম্মাদের (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) সাহাবিদের কথা ভিন্ন। আজও তাদের জীবনের প্রতিটি পদরেখা আমরা খুঁজে পাই ইতিহাসের পাতায়–কলমের কালির আবরণে।

---

[১৪] সুরা আনকাবুত : ১৪

[১৫] সুরা সাফ : ১৪

ভূমিকা

সাহাবির পরিচয়

রিসালাতের যুগে অনেকেই দীর্ঘ সময় নবীজির সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, অনেকেই তার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন যুদ্ধে; ছোট-ছোট অভিযানে।[২৪] অনেকেই তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সাবালক অবস্থায় তার দর্শনলাভে পবিত্র করেছেন নিজেদের অন্তরাত্মা।[২৫] কেউ-বা আবার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তো তাকে দেখেছিলেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আর তার ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য নসিব হয়নি।[২৬] এমন অনেকে ছিলেন, নববি যুগে থাকার পরও নবীকে দেখার হয়নি কোনো সুযোগ; অথচ তারা ইসলামের ভালোবাসায় নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছিলেন।[২৭]

এমন অনেকের কথা পাওয়া যায়, যারা নবীজির জীবদ্দশায় তাকে দেখতে পারেননি; কিন্তু তার ইন্তেকালের পর ক্ষণিকের জন্য হলেও তাকে দেখার সুযোগ হয়েছে।[২৮] এ ছাড়াও এমন অনেক শিশু ছিল, যাদের জন্ম হয়েছিল সেই বরকতময় সময়ে, তাদের পিতা-মাতারা তাদেরকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নবীজির দরবারে; নবীজি তাদের নাম রেখেছিলেন, তাদের জন্য করেছিলেন কল্যাণের দোয়া।[২৯]

প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন, রাসুলকে দেখার এবং তার সাথে সময় যাপনের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা স্বাভাবিকভাবেই পাঠকমনে এমন প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাবে যে, তাদের মধ্যে কাকে সাহাবি বলা হবে; কাদের ক্ষেত্রে করা হবে মর্যাদাপূর্ণ শব্দটির প্রয়োগ?

---

[২৪] যেমন, খুলাফায়ে রাশেদিন এবং প্রবীণ সাহাবিগণ।

[২৫] যেমন, বিদায় হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণ।

[২৬] যেমন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল।

[২৭] যেমন, ওয়াইস কারনি এবং আহনাফ ইবনে কায়স।

[২৮] যেমন, ইবনে আবু আইয়ুব বাজালি।

[২৯] যেমন, উবাইদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নাওফেল, আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা আনসারি এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক রা.। এসকল সাহাবি জন্ম নিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের তিন মাস পূর্বে, বিদায় হজের মৌসুমে।

সাহাবিদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, যাদের থেকে বর্ণনা করা হয়; সেইসাথে তারা বিবেচিত হন উম্মাহর জন্য উত্তম আদর্শরূপে।

গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকে উসুলবিদদের বক্তব্য। এতে করে যদিও স্বল্প সময়ের সান্নিধ্য বা সামান্য সময়ের সাক্ষাৎ পাওয়া ব্যক্তিরা সাহাবির কাতার থেকে বাদ পড়ে যান, তবে এর রয়েছে ভালো একটি দিক। এর মাধ্যমে সাহাবি হওয়াটা এক বিশেষ মর্যাদার মানদণ্ডে উন্নীত হয়। দীর্ঘ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবিরা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

এ ছাড়া অন্য বক্তব্যের কোনোটাই আপত্তির উর্ধ্বে নয়। কোনোটাতে এতটাই ছাড় দেওয়া হয়েছে যে, সে যুগের সব ব্যক্তিকেই সাহাবি বলতে হয়। আবার কোনোটায় বিষয়টাকে এতটাই কঠিন করে ফেলা হয়েছে যে, অনেক মর্যাদাবান সাহাবিকেও এই কাতার থেকে বাদ দিতে হয়।

সাহাবি কারা– এই প্রশ্নের উত্তরে উসুলবিদরা মাসআলা ও বর্ণনা গ্রহণের দিকটি লক্ষ করেছেন। এজন্য তারা কেবল ওই ব্যক্তিদেরকেই সাহাবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যারা অর্জন করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সাহচর্য।

অপরদিকে জমহুরের (অধিকাংশ উলামা) নিকট সাহাবি হওয়ার মানদণ্ড হচ্ছে শুধুমাত্র তাকওয়া ও আত্মিক পবিত্রতা। এজন্য তাদের মতে যারা মুসলমান অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন অথবা তার সাথে ক্ষণিকের জন্য হলেও সাক্ষাৎ করেছেন; তাদের প্রত্যেকেই সাহাবি।

সাহাবিদের সংখ্যা

সাহাবিদের জীবনী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, সবগুলো থেকেও তাদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন বিষয়। বিষয়টি সেসব গ্রন্থের রচয়িতারাও অকপটে স্বীকার করেছেন। আল্লামা ইবনে আসির জাজারি রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ উসদুল গাবাহতে লেখেন,

و لو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكره العلماء.

‘সে সময় সাহাবিরাই যদি অন্যান্য সাহাবিদের নাম সংরক্ষণ করতেন, তাহলে তাদের সংখ্যা আলেমদের বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হতো।’[৩৮]

[৩৮] উসদুল গাবাহ : ১/০৩

আবু যুরআ রাজির মতে, নবীজির ইন্তেকালের সময় তাকে দেখেছেন এবং তার থেকে হাদিস শুনেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল নারী-পুরুষ মিলিয়ে লাখেরও বেশি। তাদের প্রত্যেকেই রাসুলের নিকট শোনা হাদিস অন্যের কাছে বর্ণনা করেছেন।[৪৪]

ইসতিআব গ্রন্থের পাদটীকায় আল্লামা ইবনে ফাতহুন রহ. উপরিউক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে লেখেন, 'আবু যুরআ রহ. এখানে কেবল বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা-ই বলেছেন; নতুবা এর বাইরে সাহাবিদের সংখ্যা আরও বেশি।'[৪৫]

সারকথা হলো, বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত সাহাবির নাম এবং সংখ্যার কথা তো আমরা বলতে পারি; কিন্তু এর বাইরেও যে কত সাহাবি আছেন, তা নির্ধারণ করা আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

উসদুল গাবাহর গ্রন্থকার লেখেন, দীনি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে খোদ সাহাবিদের পক্ষেই তাদের কাফেলার পূর্ণ সদস্যসংখ্যা গণনা করে রাখা সম্ভব হয়নি।[৪৬] এ ছাড়াও অনেক সাহাবি ছিলেন গ্রাম্য–মরুবাসী (বেদুইন)। তাদের নাম-ঠিকানা অজানা থাকাটাই স্বাভাবিক।[৪৭]

সাহাবি চিনব যেভাবে

কারো ব্যাপারে সাহাবি হওয়ার দাবি করা হলে, তিনি আসলেই সাহাবি কি না তা বোঝার কিছু পদ্ধতি রয়েছে; আছে কিছু আলামত। এ পর্যায় আমরা সেই আলামতগুলো নিম্নে তুলে ধরছি :

১. তার সাহাবি হওয়ার বিষয়টা তাওয়াতুর তথা বৃহৎ জনসংখ্যার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। সাইয়্যেদুনা আবু বকর, উমর, উসমান, আলি এবং সকল প্রখ্যাত সাহাবির সাহাবি হওয়াটা এ পদ্ধতিতেই প্রমাণিত।

২. তাদের সাহাবি হওয়াটা তাওয়াতুরের পদ্ধতিতে প্রমাণিত না হলেও কমপক্ষে মাশহুর বর্ণনার পদ্ধতিতে হতে হবে।[৪৮] উকাশা ইবনে মিহসান এবং জিমাম ইবনে সালাবা রা.-এর সাহাবি হওয়াটা এই পদ্ধতিতে প্রমাণিত।

---

[৪৪] তাজরিদ : ১/৩; মুকাদ্দামাতুল ইসাবাহ : ০৩

[৪৫] প্রাগুক্ত।

[৪৬] মুকাদ্দামায়ে উসদুল গাবাহ : ০৩

[৪৭] মুকাদ্দামাতুল ইসাবাহ : ০৪

[৪৮] যে বর্ণনার বর্ণনাকারী কোনো যুগেই দুজনের কম ছিল না, প্রতিটি যুগেই তিন বা তার অধিক ছিল; কিন্তু তাওয়াতুর বা প্রচুর পরিমাণ বর্ণনাকারীও ছিল না, এমন বর্ণনাকে মাশহুর বলে।- অনুবাদক

গ. কিন্তু যদি তিনি দীর্ঘ সময় রাসুলের সাথে কাটানোর এবং তার সাথে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের দাবি করেন, তবে তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে। কেননা এক্ষেত্রে অন্যরা তাকে না দেখাটাই অস্বাভাবিক। সুতরাং বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়া তাকে সাহাবি হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না।

ঘ. মুহাদ্দিস ইবনে আবদিল বার রহ. এক্ষেত্রে অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। দুই শর্তের অধীনে এ ধরনের ব্যক্তিকেও সাহাবি বলার পক্ষে মত দিয়েছেন : এক. দেখতে হবে, এই দাবি করার পূর্বে তিনি লোকসমাজে বিশ্বস্ত এবং গ্রহণযোগ্য ছিলেন কি না। দুই. অন্য কোনো বিষয় দ্বারা তার এই দাবি ভুল মনে হয় কি না। উদাহরণত, হিজরতের এক শতাব্দী পর যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে সাহাবি হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা করে, তবে তার এই দাবি অগ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। কেননা বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, সাহাবিদের যুগ অবশিষ্ট থাকবে হিজরি প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত। এরপর আর কোনো সাহাবি জীবিত থাকবেন না।

ষষ্ঠ হিজরিতে রতন হিন্দি নামে এক ব্যক্তি সাহাবি হওয়ার দাবি করেছিল। কিন্তু মুহাদ্দিসরা শক্ত ভাষায় তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তাকে আখ্যায়িত করেছেন চরম মিথ্যুক ও প্রতারক হিসেবে।

আদালতে সাহাবা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে : الصحابة كلهم عدول তথা সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আদেল। এ ব্যাপারে আকিদার প্রসিদ্ধ কিতাব আল-মুসায়ারার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল মুসামারায় বলা হয়েছে,

> اعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة رضي الله عنهم وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم
>
> 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকের জন্য আদালত সাব্যস্ত করা, তাদের দোষচর্চা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব।'[৪৯]

আল্লামা কুরতুবি রহ. এ ব্যাপারে বলেন,

> الصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفيائه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذة الامة.

[৪৯] আল মুসামারা, ২/১৫৮, আল মাকতাবাতুল আযহারিয়া লিত তুরাস

ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا و بغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا.

'আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ভালোবাসি। তবে তাদের কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না। তাদের কারো থেকে নিজেদের সম্পর্কহীন মনে করি না। যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে এবং ভালো ছাড়া যারা তাদের ব্যাপারে অন্য কিছু বলে, তাদের প্রতি আমরা বিদ্বেষ রাখি। আমরা ভালো ছাড়া অন্য কোনোভাবে সাহাবিদের আলোচনা করি না। তাদের ভালোবাসাকে আমরা দীন, ঈমান ও ইহসান মনে করি। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখাকে (স্তরভেদে) কুফরি, নেফাকি এবং আল্লাহর অবাধ্যতা মনে করি।'[৭২]

সাহাবি-যুগ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির সময় থেকে শুরু হয়ে সাহাবায়ে কেরামের মোবারক যুগের ব্যাপ্তি ছিল হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। মূলত এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছিল নবীজির অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী। তার পবিত্র জবানে উচ্চারিত হয়েছিল :

فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

যারা আজ পৃথিবীতে আছে, আগামী একশো বছর পর তাদের কেউ-ই জীবিত থাকবে না।[৭৩]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুলের পবিত্র জবান থেকে এমন বাক্য শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বিধায় পড়ে যান। মূলত এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, সাহাবিযুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।[৭৪]

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ও তাদের সময়কাল পর্যালোচনা করে আমাদের নিকট রাসুলের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় ফুটে ওঠে। ৮৮ হিজরি, মতান্তরে ৯১ হিজরিতে মদিনার সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকাল

---

[৭২] মতনু আকিদাতুত তহাবি, পৃ. ২৯, দারু ইবনে হাযম।
নোট : 'আদালতে সাহাবা' অংশটুকু পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপন করেছেন- মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন।

[৭৩] সহিহ মুসলিম : ২৫৩৭

[৭৪] সহিহ বুখারি : ৬০১, কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাহ, এশার পর কথা বলা প্রসঙ্গ; মুসনাদে আহমাদ : ৬০২৮; সহিহ মুসলিম : ৬৪৮০ (২৫৩৭)

তখনই তিনি সম্পূর্ণ সুরা মুখস্থ করে ফেলেন এবং একপর্যায় মুসলমান হয়ে যান।[৮৭]

এ ছাড়াও অনেক সাহাবি কুরআনের প্রভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরআনের আয়াত তাদের হৃদয়ে এনেছিল হেদায়াতের নুর। আবু উবাইদা, আবু সালামা, আরকাম ইবনে আবু আরকা এবং উসমান ইবনে মাজউনের মতো সাহাবিরা রাসুলের কাছে এসেছিলেন। রাসুল তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদেরকে শুনিয়েছিলেন কুরআনের শাশ্বত বাণী। ফলশ্রুতিতে তাদের হৃদয় হয়ে উঠেছিল ইসলামের বরকতে আলোকিত, আলোড়িত।[৮৮]

প্রিয় পাঠক, জেনে আশ্চর্য হবেন যে, কুরআনে কারিমে পারস্যের উপর রোমানদের বিজয় সম্পর্কিত যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা বাস্তবে রূপ নেওয়ার পর অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।[৮৯]

নবী-চরিত্রের প্রভাব

জনৈক ব্যক্তি একবার কিছু বকরি চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রয়োজন পূরণ করেন। নবীজির এই দাতাসুলভ আচরণে অবাক হয়ে ওই ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট গিয়ে চিৎকার করে বলে, 'লোকসকল! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত উদার যে, দান করার সময় নিজের অভাব হবে কি না, সেদিকে কোনো লক্ষই করেন না।'[৯০]

একবারের ঘটনা। জনৈক ইহুদির কাছে রাসুলের কিছু ঋণ ছিল। সময় আসার পূর্বেই সে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতে থাকে। রাসুলকে এতটাই চাপ দিতে থাকে যে, ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত তার পিছু লেগে যায়। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম ইহুদিকে কঠোর ভাষায় ধমকি দেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমাকে কোনো জিম্মির উপর জুলুম করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।' এ দৃশ্য দেখে সেই ইহুদি মুসলমান হয়ে যান। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম। নবীজিকে এতটা চাপ দেওয়ার

[৮৭] মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩৩৫ (১৮৯৫৮)
[৮৮] উসদুল গাবাহ, তাজকিরাতু আবু সালামা ইবনে আবদিল আসাদ।
[৮৯] সুনানে তিরমিজি : ২৯৩৫, তাফসির অধ্যায়, সুরা রুম।
[৯০] সহিহ মুসলিম : ২৩১২ ফাজায়েল অধ্যায়।

পেছনে আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল; তাওরাতে শেষ নবীর যে গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, আমি চাচ্ছিলাম সেগুলোর পরীক্ষা নিতে।'[৯১]

সুমামা ইবনে আসালকে বন্দি করে নিয়ে আসা হয়েছিল রাসুলের কাছে। রাসুল তাকে চাইলেই শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি তাকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করেন। এই মহানুভব আচরণে বিস্মিত হয় তার অন্তরাত্মা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। রাসুলকে জায়গা দেন হৃদয়ের মণিকোঠায়। রাসুলের শহর মদিনাকে ভালোবাসেন মনের গভীর থেকে।[৯২]

নবীজির উপদেশের প্রভাব

দিমাদ রা. তখনও মুসলমান হননি। মক্কায় এলে কাফেরদের মুখে শুনতে পান, মুহাম্মাদ পাগল হয়ে গেছে। তিনি নবীজিকে দেখতে গিয়ে বলেন, 'আমি পাগলের চিকিৎসা করি। চাইলে আপনারও চিকিৎসা করতে পারি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বললেন; কিন্তু এই কথাগুলোর প্রভাব তার হৃদয়ের এতটা গভীরে রেখাপাত করে যে, সাথে-সাথেই তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।[৯৩]

হালিমা রা.-এর স্বামী। নবীজির দুধপিতা। মক্কায় এলে কুরাইশরা তাকে বলে, 'শুনেছো! তোমার সন্তান বলছে, মরার পর মানুষকে না কি আবার জীবিত করা হবে।' তিনি নবীজির কাছে এলেন। স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, 'পুত্র আমার, এসব কী বলো তুমি!?' উত্তরে রাসুল সা. বললেন, 'সেদিন এলে আমি আপনার হাত ধরে বলব, যা কিছু আমি বলেছিলাম সঠিক বলেছিলাম।' এই সামান্য কথার প্রভাবে তার হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়। তিনি একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়ে আশ্রয় নেন ইসলামের ছায়ায়। সেদিনের সেই সামান্য কথার প্রভাব তার হৃদয়কে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, জীবনভর তিনি বলতেন, 'পুত্র যদি আমার হাত ধরে, তাহলে অবশ্যই সে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।'[৯৪]

নবীজির শামায়েলের (দেহসৌষ্ঠব ও বাহ্যিক আকার-আকৃতি) প্রভাব

কিছু সাহাবি কেবল নবীজির গঠন ও অপরূপ সৌন্দর্য দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু রাফে তার নিকট এসেছিলেন কুরাইশদের দূত হয়ে; কিন্তু

---

[৯১] মিশকাত, নবীজির চরিত্র অধ্যায়।

[৯২] সহিহ মুসলিম : ১৭৬৪ (৪৫৮৯) জিহাদ অধ্যায়; মুসনাদে আহমাদ : ৯৮৩৩; সহিহ বুখারি : ৪৩৭২

[৯৩] সহিহ মুসলিম : ৮৬৮, জুমা অধ্যায়, সালাত ও খুতবা সংক্ষিপ্তকরণ অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ : ২৮৪৯

[৯৪] আল-ইসাবাহ, তাজকিরাতু হারিস ইবনে আবদিল উজজা।

নবীজির দিকে চোখ পড়তেই হৃদয়ে শুরু হয় পরিবর্তনের ঝড়। তিনি মুসলমান হয়ে যান। একপর্যায়ে প্রকাশ্যে দেন নিজের পরিবর্তনের ঘোষণা।[৯৫]

প্রিয় নবীর চেহারা মোবারক দেখেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয়–

أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ.

এমন চেহারা কোনো মিথ্যুকের হতে পারে না।[৯৬]

দাঈদের প্রভাব

ইসলামের দিকে যারা মানুষকে আহ্বান করেন, তাদেরকে দাঈ বলা হয়। এই দাঈদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাবেও অনেকে মুসলমান হয়েছিলেন। সাইয়্যেদুনা আবু বকর রা.-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন অনেক পথভোলা পথিক। ইয়ামানের লোকেরা ঈমান এনেছিলেন সাইয়্যেদুনা আলি রা.-এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে।

তুফাইল রা. তার গোত্রকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের উপর ভরসা থাকায় তারাও সাড়া দিয়েছিলেন তার ডাকে। হামদান গোত্রের লোকেরা আমের ইবনে শাহর হামদানি রা.-এর প্রভাবে এবং আবু জর গিফারির গোত্রের অর্ধেক সদস্য তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েই গ্রহণ করেছিলেন ইসলামের শাশ্বত আহ্বান।

মুজিজার প্রভাব

কোনো এক সফরের কথা। সাহাবিদের পিপাসা লেগেছে। রাসুলকে জানানো হলে তিনি দুজনকে পাঠালেন পানির খোঁজে। পানি খুঁজতে গিয়ে তারা এক উষ্ট্রারোহী নারীর দেখা পেলেন। নারীর সাথে ছিল দুটি পানির মশক। তাকে রাসুলের কাছে নিয়ে আসা হলো। নবীজি একটি পাত্র আনালেন। সেখানে পানি ঢেলে মশকের মুখ বন্ধ করে দিলেন। সাহাবিদের মাঝে ঘোষণা করা হলে সকলেই এসে একে-একে নিবারণ করলেন নিজেদের তৃষ্ণা। মহিলাকে তার মশক ফিরিয়ে দেওয়া হলে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন মশকের পানি একটুও কমেনি। যা ছিল তা-ই আছে। নারীর বিস্ময়ের শেষ নেই। তিনি তার

[৯৫] সুনানে আবু দাউদ : ২৭৫৮, জিহাদ অধ্যায়।
[৯৬] জামে তিরমিজি : ২৪৮৫ জুহদ অধ্যায়।

গোত্রের নিকট ফিরে এসে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আসমান ও জমিনে এই ব্যক্তিই আল্লাহর সত্য নবী।'[৯৭]

নবীজি হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তার দরবারে উপস্থিত হয়ে অদৃশ্যের কিছু জটিল বিষয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। ইচ্ছা ছিল, আসলেই তিনি নবী কি না তা পরীক্ষা করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে-একে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিলে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম অবাক হয়ে হয়ে যান। নবীপরশে ধন্য হয়ে নিজের নাম লেখান মুসলমানের কাতারে।[৯৮]

মক্কাবিজয়ের প্রভাব

বেশিরভাগ সাহাবি আমাদের উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন; কিন্তু তখন পর্যন্ত অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন ইসলামের মহাবিজয়ের। মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে সেই অপেক্ষারও অবসান ঘটে। গোটা আরব উপদ্বীপের জনতা বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মুসলমান হয়ে রাসুলের হাতে বাইয়াত হতে থাকেন। দীনের পথে তাদের এ আগমন ছিল স্বেচ্ছায়। এখানে ছিল না কোনো জোরজবরদস্তি।

বুখারির হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

> وَكَانَتِ العَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمُ الفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ.
>
> গোটা আরব সে সময় অপেক্ষা করছিল মক্কাবিজয়ের। তারা পরস্পরে বলাবলি করত, 'মুহাম্মাদ ও তার গোত্রের বিষয়টা আপাতত একপাশে রাখো। যদি সে তাদের (কুরাইশদের) উপর বিজয়ী হয়, তাহলে বুঝবে সে সত্য নবী।' অবশেষে মক্কাবিজয় হয়। আরবে অবস্থানরত প্রতিটি গোত্র অল্প সময়েই আনন্দচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়।[৯৯]

---

[৯৭] সহিহ বুখারি : ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৫৭১, তায়াম্মুম অধ্যায়; মুসনাদে আহমাদ : ১৯৮৯৮; সহিহ মুসলিম : ১৫৬৪ (৬৮২)

[৯৮] সহিহ বুখারি : ৩৯৩৮, ৩৩২৯, নবীজি ও তা সাথিদের হিজরত অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ : ১২০৫৭

[৯৯] সহিহ বুখারি : ৪৩০২, কিতাবুল মাগাজি; মুসনাদে আহমাদ : ২০৩৩৩

সাহাবিদের ঈমানি শক্তি

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের লোভে ঈমানকে জলাঞ্জলি না দেওয়া

ইসলামের প্রাথমিক সময় সাহাবায়ে কেরামকে কঠিন সংকটময় মুহূর্ত পার করতে হয়েছিল। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল অনেক মুসলিম পরিবারের।[১০০] অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র ছিল ইসলামবিরোধীদের ঘরে। তাদের ঘরে ছিল জৌলুস। ছিল না সম্পদের কোনো অভাব। তাদের হাতে সম্পদের এতটাই প্রাচুর্য ছিল, যার দ্বারা খুব সহজেই আঘাত করা যেত সাহাবিদের রুহানি শক্তিতে।

এমনিতেই অভাব, তার উপর আবার বিভিন্ন সময় সাহাবিদের দান-সদকা করতে হতো। বিভিন্ন যুদ্ধে এবং অভিযানে খরচ যোগাতে হতো। অবস্থার এমন সঙ্গিনতার সুযোগ নিয়ে কাফেররাও বসে ছিল না। এমন সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করতে তাদেরকে সম্পদের লোভ দেখাত।

একবারের ঘটনা। কাব ইবনে আশরাফ নামে জনৈক ইহুদিকে গুপ্তহত্যার অনুমতি লাভ করেন সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা। কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে তিনি কাব ইবনে আশরাফের কাছে বানিয়ে বানিয়ে কিছু কথা বলেন। অভাবের এই সময়ে নবীজির পক্ষ থেকে সদকা চাওয়ার সমালোচনা করে বলেন, 'সে তো আমাদের ভারী বিপদে ফেলে দিয়েছে।' পাশাপাশি তার কাছে কিছু ঋণ চান। সুযোগকে কাজে লাগায় কাব ইবনে আশরাফ। রাসুলের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে উত্তেজিত করার হীন মানসে সে বলে ওঠে, 'আল্লাহর কসম, এখন তোমরা তার প্রতি আরও বিরক্ত হয়ে পড়বে।'[১০১]

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় সাহাবিদেরকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, দুর্বল ঈমানের কোনো ব্যক্তিকে সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লোভ দেখালে নিশ্চিত সে ঈমান ত্যাগ করে কুফরের দিকে ফিরে যেত। কিন্তু

---

[১০০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৮১, কিতাবুল বুয়ু, সালাফ পরিচ্ছেদ।

[১০১] সহিহ বুখারি : ৪০৩৭, ২৫১০, কিতাবুল মাগাজি, কাব ইবনে আশরাফের গুপ্তহত্যা পরিচ্ছেদ; সহিহ মুসলিম : ৪৬৬৪ (১৮০১)

করা শুরু করেন দীন সম্পর্কে জানা সবকিছু। তার বক্তব্যের দারুণ প্রভাব পড়ে নাজাশির মনে। কাফেরদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়, তবে তারা হাল ছাড়ে না। নাজাশিকে উত্তেজিত করতে দ্বিতীয় চাল চেলে বলে, 'বাদশাহ নামদার, এরা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জঘন্য কথা বলে। তাকে আল্লাহর বান্দা মনে করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আপনি নিজেই বিষয়টি যাচাই করতে পারেন।' সাহাবায়ে কেরামকে তলব করা হলে তারা আবারও পরামর্শে বসেন। সিদ্ধান্ত হয়, ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমাদের নবী আমাদের যা শিখিয়েছেন, আমরা তা-ই বলব। নাজাশি ছিলেন খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। এ কারণেই কুরাইশদের প্রতিনিধিরা এই প্রশ্নের অবতারণা করেছিল। কিন্তু নাজাশির দরবারে উপস্থিত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম সাফ-সাফ জানিয়ে দিলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, রাসুল, তার রুহ এবং তার পবিত্র কথামালা–যা তিনি নিষ্পাপ কুমারী মারইয়ামের গর্ভাশয়ে ফুঁকে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের এমন দ্ব্যর্থহীন উত্তর শুনে নাজাশি মাটি থেকে একটি কাষ্ঠখণ্ড উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা যা বলেছ, ঈসা আলাইহিস সালাম তার চেয়ে বেশি এই কাষ্ঠখণ্ডটির মতোও ছিলেন না।'[১০৫]

তারা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছিলেন

দুর্বল মনের মানুষেরা আপদ-বিপদে কেঁপে ওঠে। সাহাবায়ে কেরামকেও দীনের জন্য সইতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট; কিন্তু তারা সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছেন। ইসলামের দুশমনদের দেওয়া সীমাহীন আঘাত তাদের ঈমান নামক অটলপ্রাচীরে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি।

বেলাল রা.-কে বর্বর মুশরিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত বালুতে ফেলে রাখত। বখাটে ছেলেরা তাকে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াত মক্কার কণ্টকাকীর্ণ উত্তপ্ত মরুপথে। এতকিছুর পরও তার ঈমানে লাগেনি সামান্যতম বলিরেখা।[১০৬]

খাব্বাব রা. ছিলেন উম্মে আনমানের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণ করার কথা শুনে উম্মে আনমার লৌহশলাকা গরম করে কখনো তার মাথায়, কখনো পিঠে ছ্যাঁকা দিত। হিজরতের পর, একদিন উমর রা. তার পিঠ দেখে হতবাক হয়ে যান। বিস্ময় চাপিয়ে রাখতে না পেরে বলেন, 'এমন পিঠ আমি কোনোদিন

[১০৫] মুসনাদে আহমাদ : ১/২০২ (১৭৪০)

[১০৬] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৫০

উমর রা.-এর চাচাতো ভাই সায়িদ ইবনে জায়েদ ইসলাম গ্রহণ করলে উমর রাদিয়াল্লাহু তাকে রশি দিয়ে বেঁধে পেটান।[১১৭]

আইয়াশ ইবনে আবু রবিআহ এবং সালামাহ ইবনে হিশাম ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা তাদের দুজনের পা একসাথে বেঁধে নির্যাতন করে।[১১৮]

সাইয়্যেদুনা আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণের পর একদিন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন। কাফেররা এ কথা শুনতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঘাতে আঘাতে মৃতপ্রায় হয়ে গেলে আবু বকরের গোত্রের লোকেরা তাকে কাপড়ে প্যাঁচিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় জ্ঞান ফিরলে নিজের ফিকির বাদ দিয়ে তিনি রাসুলকে খুঁজতে থাকেন। এহেন অবস্থা দেখে গোত্রের লোকেরা তাকে রেখে চলে যায়। তবু তার অস্থিরাবস্থা কাটে না। অবশেষে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নবীজির কাছে। নবীজি তার অবস্থা দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। তাকে জড়িয়ে ধরেন। অবয়বে চুমু খান। প্রকাশ করেন ব্যথিত মনের কথা।[১১৯]

সাহাবায়ে কেরাম দীনের জন্য ধৈর্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। তাদের সীমাহীন ত্যাগের কথা স্বীকার করেছিল খোদ আহলে কিতাবের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) আলেমরাও। ইসতিআব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত শামে গেলে জনৈক খ্রিষ্টান আলেম তাদেরকে দেখে বলেন, 'ঈসা ইবনে মারইয়ামের কিছু সাথিকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিল। কাউকে শূলে চড়ানো হয়েছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা আপনাদের চেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করার মতো ব্যক্তি ছিলেন না।'[১২০]

দীনের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ

মানুষের পক্ষে সম্পদের ভালোবাসা ত্যাগ করাও অনেক সময় সহজ হয়। দৃঢ়তা থাকলে সম্ভব হয় হাজারও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে থাকা। কিন্তু পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাটা সম্ভব হয় না। কারণ বিপদে তারাই পাশে দাঁড়ায়। সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে লক্ষ্যে অটল থাকার সাহস যোগায়। কিন্তু যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়েন, তাদেরকে অনেক সময় প্রিয় মানুষগুলোর মহব্বতকে কুরবানি করতে হয়। প্রিয়জনরা ছেড়ে গেলেও তাদেরকে একাকী এগিয়ে যেতে হয় অভীষ্ট লক্ষ্যে।

---

[১১৭] সহিহ বুখারি : ৬৯৪২, ৩৮৬২, কিতাবুল ইকরাহ, ধর্মত্যাগে প্রহার করা-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।
[১১৮] তাবাকাতে ইবনে সাদ, তাজকিরাহ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ।
[১১৯] উসদুল গাবাহ, তাজকিরাহ উম্মুল খায়র।
[১২০] আল-ইসতিআব : ০১/০৬

পরিজনকে কুফরের ঘোর আঁধারে নিমজ্জিত দেখতেন, তাদের হৃদয়ে ঝড় শুরু হতো। দুঃখ-কষ্টে মোহ্যমান হৃদয়ে তারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে উঠতেন :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করো নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও।'[১৩৪]

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের মতো আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকেও ঈমানের সম্পদ দান করো। তারা যেন এক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করে। তাদেরকে দেখে যেন আমাদের হৃদয় শীতল হয়ে যায়। আমরা সকলেই যেন মুত্তাকিদের নিকট অনুকরণীয় হতে পারি।[১৩৫]

হিজরত

সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের জন্য যত কষ্ট সহ্য করেছেন, হিজরতের ইতিহাস ও এর মধ্য দিয়ে হওয়া ত্যাগের কাহিনি তার মধ্যে সবচেয়ে বেদনাবিধুর। হাদিসে এসেছে :

إن الهجرة شانها شديد

'নিশ্চয়, হিজরতের ব্যাপারটি খুবই কষ্টদায়ক।'[১৩৬]

এ কারণে, অতীতে যারা বিভিন্ন কষ্টকর পরিস্থিতি কাটিয়ে এসেছে, তাদের অনেকেই এ জায়গাটায় এসে হোঁচট খেয়েছিল। এক বেদুইন হিজরত করে মদিনায় আসে। রাসুলের হাতে হাত রেখে বাইয়াত হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তার প্রচণ্ড জ্বর আসে। সইতে না পেরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সেখান থেকে চলে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বলেছিলেন :

إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا

'মদিনা হলো স্বর্ণকারের চুল্লির মতো, ভেজাল জিনিসকে বাইরে ফেলে দিয়ে খাঁটি সোনাকে ভেতরে ধারণ করে।'[১৩৭]

---

[১৩৪] সুরা ফুরকান : ৭৪

[১৩৫] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/১৫৯

[১৩৬] সহিহ বুখারি : ৩৯২৩, ১৪৫২ নবীজির হিজরত-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ : ১১১০৫; সহিহ মুসলিম : ৪৭৩২

[১৩৭] সহিহ বুখারি : ৭২১১, ১৮৮৩ কিতাবুল আহকাম; মুসনাদে আহমাদ : ১৪২৮৪; সহিহ মুসলিম : ৩৩৫৫

উসওয়ায়ে সাহাবা

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা আবদুস সালাম নদভি রহ.

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
অনূদিত

তাওহীদ

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন ১৫

সাহাবিদের রাজনৈতিক অবদান ১৭

আসমানি খেলাফত ১৭

তাদের মধ্যে ক্ষমতার কোনো লোভ ছিল না ১৮

খেলাফত নামক জিম্মাদারির অনুভূতি ১৯

খেলাফতের জিম্মাদারি : আবশ্যিক কর্তব্য ২১

নিষ্ঠা ও আমানতদারি ২৬

সমতা ৩০

জুহদ ও বিনয় ৩২

উৎসর্গচিত্ত ৩৭

সত্যের প্রতি ভালোবাসা ৩৮

দয়া ও উদারতা ৪০

দয়া ও সহনশীলতা ৪৫

অধিকারে সমতা ৪৭

অধিকারের ঘোষণা ৪৭

পরামর্শ ৪৯

নবুওয়াত ও খেলাফত : একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ৫০

গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে চলা ৫১

খলিফার আনুগত্য ৫৬

আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নয় ৫৯

রাজা-মহারাজাদের বিরোধিতা ৬০

বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ থেকে বিরত থাকা ৬১

অধিকার আদায় ৬২

গভর্নর ও দায়িত্বশীলদের কার্যবিবরণী ৬৪

কর্মকর্তাদের অব্যাহতি প্রসঙ্গ ৭৭

বেতন-ভাতা ৭৯

বিচার বিভাগ ৮৪
বিচার বিভাগের আইনপত্র ৮৫
কাজি নির্বাচন ৮৬
বিচারকাজের ঝুঁকি ও অনুভূতি ৮৬
ন্যায়বিচার ৮৭
ঘুসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ৮৮
অভিজ্ঞদের সাক্ষ্য গ্রহণ ৮৯
লিখিত রায়পত্র ৮৯
মামলা মোকদ্দমায় চরিত্রের প্রভাব ৯১
রাজস্ব ও কর বিভাগ ৯২
কর অধিগ্রহণ নীতিমালা ৯৫
জিজিয়া ৯৬
উশর ৯৭
জাকাত ৯৭
দেওয়ান, দফতর ও বাইতুল মাল ৯৭
জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ৯৯
কূপখনন ৯৯
চৌকি ও সরাইখানা ১০০
মেহমানখানা ১০১
চৌবাচ্চা ও নহর ১০১
নহরে সাদ ১০২
নহরে আবু মুসা ১০৩
নহরে মাকিল ১০৩
নহরে আমিরুল মুমিনিন ১০৪
সেচব্যবস্থা ১০৫
বাঁধ ১০৫
পুল ও সড়ক ১০৫
সরকারি ভবন ১০৬
প্রশাসনিক ভবন ১০৬
জেলখানা ১০৭
গুদামঘর ১০৭
রাষ্ট্রীয় কোষাগার ১০৭

বাজার ১০৮
হাসপাতাল ১০৮
সেনাছাউনি এবং দুর্গ ১০৯
কবরস্থান ১১১
হাম্মাম ১১১
ওসিয়ত ১১১
ওয়াকফ ১১২
নগরের গোড়াপত্তন ১১৪
বসরা ১১৪
কুফা ১১৫
ফুসতাত ১১৬
মুসেল ১১৬
জিযা (গিজা) ১১৬
এরদাবিল ১১৭
মারআশ ১১৭
কায়রাওয়ান ১১৭
দণ্ডবিধি ১১৯
জিম্মিদের অধিকার ১৩০
রাজনৈতিক আচরণ ১৩০
জীবনের নিরাপত্তা ১৩৪
সম্পদের হেফাজত ১৩৬
ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৩৬
জিজিয়া উসুলে নমনীয়তা প্রদর্শন ১৩৭
মতামত গ্রহণ ও কাজে নিয়োগ ১৩৮
বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ১৩৯
বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র ১৩৯
উদারতার প্রভাব ১৩৯
খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের উপর আরোপিত নির্বাসন ১৪২
খায়বারের ইহুদি ১৪২
নাজরানের খ্রিষ্টান ১৪৩
আরবাসুসের খ্রিষ্টান ১৪৪
ক্রীতদাসের অধিকার ১৪৬

যুদ্ধবন্দিদের হত্যা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ ১৪৬
যুদ্ধবন্দিদের পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ১৪৭
শাহি খান্দানের বন্দিদের সাথে আচরণ ১৪৭
যুদ্ধবন্দিদের প্রিয়জন থেকে আলাদা না করা ১৪৮
দাসীদের সাথে ইস্তিবরা ব্যতীত সহবাস অবৈধকরণ ১৪৮
দাসমুক্তি ১৪৯
আরবদেরকে গোলাম না বানানোর রীতি ১৫৫
গোলামকে মুকাতাব বানানো ১৫৬
উম্মে ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা ১৫৭
যুদ্ধবন্দিদের প্রিয়জন থেকে আলাদা না করা ১৫৭
গোলামদের জন্য ভাতা নির্ধারণ ১৫৮
গোলামদের শিক্ষাদীক্ষা ১৫৯
নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার ১৫৯
গোলামদের মর্যাদা রক্ষা ১৫৯
সমতা ১৬০
নাগরিকদের সুখ-শান্তির প্রতি গুরুত্বদান ১৬১
দুধের শিশুদের জন্য ভাতা নির্ধারণ ১৬২
বেওয়ারিশ শিশুদের ভাতাপ্রদান ১৬২
দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে ওঠার প্রস্তুতি ১৬৩
নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতি প্রণয়ন ১৬৪
ক্ষতিকর প্রাণী নিধন ১৬৫
ধর্মীয় খেদমত; ইসলামের প্রসার ১৬৬
নওমুসলিমদের দায়িত্ব গ্রহণ ১৮৬
দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৮৮
আকিদা ১৮৮
নামাজ ১৮৯
জাকাত ১৯১
হজ ১৯২
রোজা ১৯২
মদিনার সম্মান ১৯৩
বিবাহ ও তালাক ১৯৩
কুরআনের বিন্যাস ১৯৪

ইহতিসাব ১৯৭
সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ২০৫
জাহেলি যুগের সকল প্রথার মূলোৎপাটন ২০৫
শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন ২০৬
চারিত্রিক সংশোধন ২০৮
পারস্পরিক সংশোধন ২১১
জীবনযাপনকে উন্নতকরণ ২১২
নসিহত ও দিকনির্দেশনা ২১৪
নসিহত ২১৪
অনুকরণীয় আদর্শ ২১৪
ওয়াজ তথা উপদেশ ২১৫
উত্তম কথা ২১৬
জিহাদ ২১৭
জিহাদের হাকিকত ২১৭
নববি যুগে সাহাবায়ে কেরামের সামরিক নীতি ২১৭
সর্বজাতীয় দল গঠন ২১৮
বাহিনীর প্রতীক ২১৯
বাহিনীর বিন্যাস ২১৯
সামরিক প্রশিক্ষণ ২১৯
আহতদের সেবাদান ২২১
জিহাদের প্রস্তুতি ২২২
খেলাফতে রাশেদার যুগে সামরিক নীতি ২২৩
সামুদ্রিক অভিযান ২২৯
জাহাজ নির্মাণ কারখানা ২৩১
সাহাবিদের যুদ্ধজয়; কারণ ও উপলক্ষ্য ২৩২
মসজিদ নির্মাণ ২৪৬
মসজিদে জুমুআহ ২৪৮
মজজিদে ফুজাইহ ২৪৮
মসজিদে বনু কুরাইজাহ ২৪৮
মাশরাবাহ উম্মে ইবরাহিম ২৪৮
মসজিদে বনু জফর ২৪৮
মসজিদে বনু উমাইয়া ২৪৯

মসজিদে ফাতহ ২৪৯
মসজিদে কিবলাতাইন ২৪৯
মসজিদে সাকিয়া ২৪৯
মসজিদে জুবাব বা রায়া মসজিদ ২৪৯
মসজিদে উহুদ ২৪৯
আনসাবে হারাম ২৫৬
সেবামূলক অন্যান্য কর্মকাণ্ড ২৫৭
মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ ২৫৭
মসজিদে আলোর ব্যবস্থা ২৫৭
মসজিদের তত্ত্বাবধান ২৫৮
আজান ২৫৯
ইমামতি ২৫৯
হাজিদের খেদমত ২৬০
ইলমি খেদমত ২৬১
কুরআন শিক্ষা ২৬১
হাদিসের শিক্ষা ২৬৬
তালিমুল ফিকহ ২৭০
কার্যত দীক্ষা ২৭২
হস্তলেখার পাঠদান ২৭৩
ফাতাওয়া প্রদান ২৭৫
ইলমুত তাফসির ২৭৭
হাদিসশাস্ত্র ২৯২
বর্ণনাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ২৯২
সাহাবিদের ইলমে হাদিস অর্জনের পদ্ধতি ২৯৩
হাদিসের জন্য দূরতম সফর ২৯৫
সাহাবিদের হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি ২৯৭
উম্মাহ পর্যন্ত হাদিস পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সাহাবিগণের সতর্ক পদক্ষেপ ২৯৯
হাদিস বর্ণনার উদ্দেশ্য ৩০৪
সাহাবিদের নিকটে থাকা হাদিসের লিখিত ভান্ডার ৩০৫
নবীজির ফরমান ৩০৭
তাবেয়িদের লিখিত হাদিসের সংকলন ৩০৮
হাদিসের মাননির্ণয় ৩০৯

দিরায়াহ ৩১১
হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবিগণের স্তর ৩১৫
সাহাবিদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৩১৮
ইলমে ফিকহ ৩২৩
রাসুল থেকে সাহাবিগণের ইলমে ফিকহ অর্জনের পদ্ধতি ৩২৩
ফকিহ সাহাবিগণের স্তর ৩২৫
তাবেয়িদেরকে ফিকহ শিক্ষাদানের পদ্ধতি ৩২৬
মাসআলার সংকলন ৩২৮
ফিকহের মূলনীতি উদ্ভাবন ৩২৯
উদ্ভূত মাসআলায় সাহাবিগণের মতবিরোধের কারণ ৩৩২
ইলমু আসরারিদ দীন ৩৩৭
ইলমে তাসাওউফ ৩৪৭
তাসাওউফ ও সুফি ৩৪৭
খানকা ৩৫০
তাসাওউফের কিছু অতিরঞ্জন ৩৫১
তাসাওউফের পরিভাষা ৩৫৫
সিলসিলা ৩৫৬
সাহাবিদের তাসাওউফ ৩৬০
সাইয়েদুনা আবু বকর রা. ৩৬২
সাইয়েদুনা উমর রা.-এর তাসাওউফ ৩৬৭
তাসাওউফে সাইয়েদুনা উসমান রা. ৩৭০
সাইয়েদুনা আলি রা.-এর তাসাওউফ ৩৭২
আসহাবে সুফফা ৩৭৩
অন্য সাহাবিগণের তাসাওউফ ৩৭৭
সাহাবিদের তাসাওউফের হাকিকত ৩৭৯
মাকাম ও হালত ৩৮৪
মাকাম ও হালত সৃষ্টির প্রক্রিয়া ৩৮৫
কুলজিশাস্ত্র ৩৯৭
ইতিহাসশাস্ত্র ৩৯৯
কাব্য ও কবিতা ৪০১
বক্তব্য ও ভাষণ ৪১৬
পরিশিষ্ট ৪২২

সাহাবায়ে কেরামের প্রভাব ৪২২
দীনের ক্ষেত্রে সাহাবিগণের প্রভাব ৪২২
সাহাবিদের চরিত্রের প্রভাব ৪২৩
তাদের জ্ঞানের প্রভাব ৪২৫
অন্যান্য ক্ষেত্রে সাহাবিগণের প্রভাব ৪২৬
আকিদার ব্যাপারে সাহাবিগণের প্রভাব ৪২৯
সাহাবিদের রাজনৈতিক প্রভাব ৪৩০
গ্রন্থপঞ্জি ৪৩২
হাদিসের কিতাব ৪৩২
তারাজিম বা জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ ৪৩৫
কিতাব পরিচিতিমূলক গ্রন্থ ৪৩৭
আসমাউর রিজালের কিতাব ৪৩৭
ইতিহাস-সংক্রান্ত কিতাব ৪৩৮
বিবিধ ৪৩৯

প্রাক্‌কথন

إن الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইবাদাত, অনুপম আখলাক-চরিত্র, রাজনীতি এবং ইলমে মারেফতের পূর্ণ আধার। তার সমগ্র সত্তা জুড়ে এই চারটি বিষয় ছিল পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এগুলোর মৌলিক আলোচনা বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে কুরআন-হাদিসে। এজন্য নবীজির ইন্তেকালের পর গুরুত্বপূর্ণ এই চারটি মিশন টিকিয়ে রাখা সাহাবিগণের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা এই মিশনগুলোকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হন। ব্যয় করেন নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা। তাদের সেই চেষ্টা, প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ কর্মধারাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করাই আমাদের এ বক্ষ্যমাণ খণ্ডের লক্ষ্য।

যেহেতু নবীজির ইন্তেকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খুলাফায়ে রাশেদিনই এই দায়িত্বগুলো পালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, এজন্য আলোচ্য অংশে তাদের কথাই বেশি উঠে আসবে। তবে মনে রাখতে হবে, তাদের তত্ত্বাবধানে সকল সাহাবিই ছিলেন এ মিশনগুলো বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাদের কেউ ছিলেন মসজিদের ইমাম, কেউ ছিলেন শিক্ষক, কেউ ছিলেন গভর্নর, কেউ বা ছিলেন বিচারক আর কেউ সেনাপতি। মোটকথা, রাসুলের কর্মধারাকে টিকিয়ে রাখার মিশনে খুলাফায়ে রাশেদিনের নেতৃত্বে সকল সাহাবির সরব পদচারণা ছিল মসজিদ থেকে শুরু করে ক্ষমতার মসনদে—দরসের পরিবেশ থেকে রণাঙ্গনের উত্তপ্ত প্রান্তর অবধি।

যারা আগের অংশ পড়েছেন, অবশ্যই দেখেছেন ইবাদাত, অনুপম আখলাক-চরিত্র এবং সামাজিক জীবনযাপনের উৎকর্ষের পেছনে সাহাবিগণের ভূমিকাগুলো। এ অংশে আপনারা দেখতে পাবেন রাজনীতি ও জ্ঞান-সাধনার পরিমণ্ডলে নববি দীক্ষা কীভাবে একেকজন সাহাবিকে পরিণত করেছিল পুরোধা ব্যক্তিত্বে। কীভাবে তারা নবী থেকে প্রাপ্ত সেই দীক্ষার মাধ্যমে

আলোকিত করেছিলেন তখনকার পৃথিবী। দিয়েছিলেন বিশ্বকে ইবাদাত, আখলাক-চরিত্র এবং রাজনীতির ময়দানে নবীজির বাতলানো সবক।

অন্য নবী-রাসুলগণও তাদের সারথিদের উপর্যুক্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ সেগুলোকে টিকিয়ে রাখতে যেভাবে সংগ্রাম করেছেন, অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায় না। অথচ বাস্তবতা তো হলো, কোনো চিরন্তন বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে সাহাবিপন্থি পথিকের প্রয়োজনই দিকে দিকে; সর্বযুগে–সর্বকালে।

আবদুস সালাম নদভি
শিবলি মনজিল, আজমগড়
১১ই জুলাই, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ

সাহাবিদের রাজনৈতিক অবদান

আসমানি খেলাফত

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলিফা বানাবেন, যেমন খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। তাদের জন্য তিনি সেই দীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। পাশাপাশি তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞ হবে, বস্তুত তারাই সাব্যস্ত হবে অবাধ্য হিসেবে।’[১]

খেলাফত আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। এর অধিকার সাব্যস্ত হয় শুধুমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে। এজন্যই মানব সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতারা খেলাফতের অধিকারের কথা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, খেলাফতের জন্য যা প্রয়োজন, সেই কাজে তো আমরাই নিয়োজিত আছি। তাদের সেই কথোপকথনের ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ

[১] সুরা নুর : ৫৫

‘এবং সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোনো, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বানাতে চাই। ফেরেশতারা তখন বলেছিল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি বিস্তার করবে, খুনখারাবি করবে। অথচ আমরাই তো আপনার তাসবিহ, হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণায় সদা নিয়োজিত আছি।’[২]

প্রিয় পাঠক, এই গ্রন্থের পূর্বাংশে আমরা সাহাবিগণের ঈমান ও আমল নিয়ে আলোচনা করেছি। সেই অধ্যায়গুলো পড়ে থাকলে সহজেই অনুধাবন করবেন, সাহাবিগণ ঈমান ও আমলে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই নিজেদেরকে খেলাফতের প্রকৃত হকদার সাব্যস্ত করেছিলেন। বক্ষ্যমাণ খণ্ডে আমরা প্রামাণিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করব, আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত এই দায়িত্ব তারা কীভাবে সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কীভাবে খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন সঠিক মানহাজে। খেলাফতের সুরভিত সুষমায় কীভাবে সুশোভিত করেছিলেন সারা পৃথিবীকে।

তাদের মধ্যে ক্ষমতার কোনো লোভ ছিল না

শাসন ও ক্ষমতা যদি হয় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-সংক্রান্ত আল্লাহর মহান হুকুমকে বাস্তবায়ন করার অন্যতম মাধ্যম, তখন ক্ষমতা গ্রহণও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যিক বিধান। কিন্তু যদি এই ক্ষমতা হয় ব্যক্তি লালসা চরিতার্থ করার স্বার্থে, তাহলে জেনে রাখা ভালো, এর চেয়ে খারাপ কিছু পৃথিবীতে নেই। এজন্য কোনো হুকুমতের ব্যাপারে আমাদের সর্বপ্রথম জানা উচিত, তাদের ক্ষমতার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পারব, সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, ক্ষমতার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র লালসা ছিল না। তবে হ্যাঁ, যেই ক্ষমতা ইসলামের খেদমতের জন্য সহায়ক ছিল, সেই ক্ষমতাকেও সাহাবায়ে কেরাম ভালোবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ক্ষমতা নয়, ছিল দীনকে প্রতিষ্ঠা করার এক মাধ্যম।

খায়বারের যুদ্ধ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দেন, ‘আমি আজ বাহিনীর পতাকা এমন ব্যক্তির হাতে দেব, যার সঙ্গে আল্লাহ ও রাসুলের

[২] সুরা বাকারা : ৩০

দোস্তি আছে। যার হাতেই আল্লাহ খায়বারের বিজয় লিখে রেখেছেন।' এ ঘোষণা শোনার পর দীনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ আসনটি অধিগ্রহণের জন্য সকল সাহাবির মন সেদিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো সময় সাহাবায়ে কেরাম নিছক ক্ষমতার আগ্রহী হননি। উমর রা. বলেছিলেন, 'খায়বারের সেদিন ছাড়া অন্য কোনো সময় আমার মনে নেতৃত্ব পাওয়ার লোভ জাগ্রত হয়নি।'[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল-পরবর্তী সময় বনু সায়িদার বৈঠকখানায় খেলাফত নিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যকার আলোচনার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তখনো প্রকাশ পেয়েছিল সাহাবিগণের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জ্যোতি। লক্ষ করুন, আলোচনা চলাকালে দৃশ্যত আনসারগণ ছিল মুহাজিরদের প্রতিপক্ষ। কিন্তু সেই আনসারদেরই এক সদস্য জায়েদ ইবনে সাবিত রা. আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুহাজির; এজন্য মুহাজিরদের মধ্য থেকেই খলিফা হওয়া উচিত। যেভাবে আমরা নবীজির সহযোগী ছিলাম, ঠিক তেমনই তার খলিফারও সহযোগী হব।'[৪]

ক্ষমতার ব্যাপারে নির্লোভ থাকার এই মহৎ গুণের কারণেই আমরা দেখতে পাই, খুলাফায়ে রাশেদিনের পুরো সময়ে দীনের স্বার্থকে রক্ষার মিশনে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো ধরনের বিবাদ সংঘটিত হয়নি।

খেলাফত নামক জিম্মাদারির অনুভূতি

ক্ষমতা যদি হয় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের মাধ্যম, তবে এর দায়িত্ববোধ ততটুকুই, যতটুকু একটা পশু তার ক্ষুৎপিপাসাকে নিবারণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। তবে যদি ক্ষমতার উদ্দেশ্য হয় পৃথিবীতে ভালো কাজের বিস্তার ঘটানো এবং অসৎ কর্মের গতি ঠেকানো, তাহলে সেই ক্ষমতা গ্রহণ করে পবিত্র আমানতের রূপ। ক্ষমতা হয়ে যায় এক মহা দায়িত্ব। ভারী সম্পদ। যার ভারে কাঁপতে থাকে আসমান ও জমিন।

সাহাবায়ে কেরামের তো কোনো লালসা ছিল না। তাদের হাতে যখন ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যম হিসেবে ক্ষমতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, কেঁপে ওঠে তাদের অন্তরাত্মা। যখনই যেকোনো খলিফা খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কারো ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি।

---

[৩] সহিহ মুসলিম : ২৪০৫ ফজিলত অধ্যায়, আলি ইবনে আবু তালেব রা.-এর মর্যাদা প্রসঙ্গ।

[৪] মুসনাদে আহমাদ : ৫/১৮৬ (২১৬১৮)

সাইয়েদুনা আবু বকর রা.-কে খলিফা মনোনীত করা হলে তিনি তার প্রদত্ত প্রথম ভাষণে বলেছিলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِي، وَلَئِنْ أَخَذْتُمُونِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُطِيقُهَا، إِنْ كَانَ لَمَعْصُومًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ

'লোকসকল, মন থেকে চেয়েছিলাম, দায়িত্বের এ বোঝা যেন অন্য কারো ঘাড়ে চাপে! তোমরা যদি চাও আমি তোমাদের নবীর পূর্ণ অনুসরণ করি, আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কারণ, তিনি তো শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ ছিলেন, আসমানি ওহি তাকে পথ নির্দেশ করত। (কিন্তু আমি তো তেমন নই।)'[৫]

সাইয়েদুনা উমর রা. বলেন, 'অন্য কেউ এ বোঝা বহনের সক্ষমতা রাখলে, এই গুরুদায়িত্বের ভার তার কাঁধে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যেতাম। আমার গর্দান তরবারির আঘাতে উড়িয়ে দেওয়া হলেও তা আমার নিকটে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার চেয়ে সহজতর মনে হবে।'[৬]

তিনি একবার হজ থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে থেমে যান। অনেকগুলো কঙ্কর একত্রিত করেন। চাদর বিছিয়ে তাতে চিত হয়ে শুয়ে পড়েন। আসমানের দিতে হাত তুলে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আমার বয়স হয়ে গেছে। শরীরের শক্তি কমে গেছে। দায়িত্বও বেড়ে গেছে অনেক। প্রভু হে, আমাকে উঠিয়ে নাও; যেন আমার আমলগুলো বরবাদ হয়ে না যায়, আমি যেন ইতিদালের সীমানাকে অতিক্রম না করি।'[৭]

তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। লোকেরা আবেদন করে পরবর্তী খলিফার নাম ঘোষণা করে যেতে। তিনি তাদের এই আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই বোঝা আমি জীবিত থাকতে বহন করেছি। মৃত্যুর পরও তা বহন করতে পারব না। শুধু এতটুকুই চাই, পাপ-পুণ্যের সমতা নিয়ে যেন দুনিয়াকে বিদায় জানাতে পারি।

প্রিয় পাঠক, খেলাফতের এই মহান জিম্মাদারির ব্যাপারে এমনটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের অনুভূতি। এ কারণে সর্বাবস্থায় তারা সকলের অধিকার রক্ষার ওসিয়ত করেছেন। মুহাজির, আনসার, বেদুঈন বা জিম্মি– কারো

[৫] মুসনাদে আহমাদ : ১/১৪ (৮০)

[৬] মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ : ৯৬৪ নাওয়াদির প্রসঙ্গ।

[৭] মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ : ৬৯৩

অধিকার যেন খর্ব না হয়, এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন স্থলাভিষিক্তদের। বুখারিতে বর্ণিত উসমান রা.-এর বাইয়াত-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে যে বর্ণনা রয়েছে, ওসিয়তের বিস্তারিত বিবরণে আগ্রহী পাঠকগণ সেখানেই দেখতে পারেন।

খেলাফতের জিম্মাদারি : আবশ্যিক কর্তব্য

আল্লাহ তায়ালা তার সবচেয়ে বড় উপহার খেলাফত প্রদান করেছিলেন সাহাবায়ে কেরামকে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন মহান এ দায়িত্বকে পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিতে কী কী করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে, তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে। নিশ্চয় সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।

মোটকথা, আল্লাহ তায়াল যখন কোনো জাতিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় কার্যকর করা আবশ্যক হয়ে যায় :

- নামাজ কায়েম করা।
- জাকাত প্রদান করা।
- সৎ কাজের আদেশ করা।
- অসৎ কাজের নিষেধ করা।

এই চারটি বিষয়কে আমরা আবার মৌলিকতার বিচারে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি; ইবাদাত, আচার-ব্যবহার ও রাজনীতি।

সাহাবিরা স্ব-স্ব যুগে যে পূর্ণতার সাথে দায়িত্বগুলোর আঞ্জাম দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা এ খণ্ডেরই অন্য কোনো অংশে করব। এ পর্যায় শুধু এমন কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব, উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালনে সাহাবিগণ যেগুলো আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং একনিষ্ঠতার সাথে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

আধুনিক যুগের শাসকরা রাতের বেলা বের হওয়াকে অসাধারণ কিছু মনে করে থাকেন। অথচ সাইয়েদুনা আবু বকর রা. খলিফা হওয়ার পরও দীর্ঘ সাত মাস

ছিলেন মদিনার বসতি থেকে দূরে সাখ নামক স্থানে। সেখান থেকে প্রতিদিন তিনি কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো-বা সাওয়ারিতে করে মসজিদে নববিতে উপস্থিত হতেন। ইশার নামাজ পড়ে আবার চলে যেতেন নিবাসে।[৮]

ভোরে উঠে সাইয়েদুনা উমর রা.-এর প্রথম কাজ ছিল তাহাজ্জুদ পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের ফজরের জন্য জাগিয়ে দেওয়া।[৯] ইশার পর তার সর্বশেষ কাজ ছিল মসজিদের দেখাশোনা করা; নামাজরত ব্যক্তি বাদে অযথা সময় নষ্টকারীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া। অবাক করার বিষয় হলো, তিনি মনে করতেন তার উপর অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব তখনো শেষ হয়নি। এজন্য তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে মদিনা পাহারা দিতেন।[১০]

একরাতে তিনি বের হন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর সঙ্গে। হঠাৎ দেখতে পান অদূরে একটি ঘরে আলো জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে ভেসে আসছে শোরগোলের আওয়াজ। পাশে থাকা আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-কে বলেন, 'এটা কার বাড়ি জানো! রবিআ ইবনে উমাইয়ার। সে এত রাতে শরাব পান করছে। এখন আমাদের কী করা উচিত বলে মনে করো!?' ইবনে আউফ রা. বলে ওঠেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ আমাদেরকে অপরের দোষ তালাশ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে সাইয়েদুনা উমর রা. সেখান থেকে ফিরে আসেন।[১১]

মদিনায় তিনি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজেই সেখানে যেতেন। গরিব-দুঃখীদের খাইয়ে দিতেন আপন হাতে।

এক বিদেশি কাসেদ একবার দরবারে খেলাফতে গিয়ে দেখে উমর রা.-এর হাতে লাঠি। তিনি ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের আহার করাচ্ছেন। সেদিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সেই বার্তাবাহী ভিনদেশি দূত।[১২]

সাইয়েদুনা উমর ইশার পর ঘুরে ঘুরে মসজিদে থাকা সকলের চেহারা দেখতেন। জিজ্ঞাসা করতেন, খাবার খেয়েছে কি না। কেউ ক্ষুধার্ত থাকলে তাকে ঘরে নিয়ে খাবার খাওয়াতেন।[১৩]

---

[৮] উসদুল গাবাহ : ৩/৩১০-৩২২ (৩০৬৬) তাজকিরাতু আবু বকর সিদ্দিক।

[৯] ফুতুহুল বুলদান : ৪৪৫

[১০] খুলাসাতুল ওয়াফা : ২/২০৭

[১১] আল-ইসাবাহ, তাজকিরাতু রবিআ ইবনে উমাইয়া। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্তই ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে বিবৃত হয়েছে।

[১২] তারিখে তাবারি, পৃষ্ঠা : ২৭০২

[১৩] তবাকাতে ইবনে সাদ, তাজকিরাতু উম্মে হাবিবা খাওলা।

কোনো বাহিনীকে অভিযানে পাঠালে, সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন তাদের ফিকিরে। তিনি বলতেন, 'নামাজ যখন আদায় করি, তখনো মাথায় থাকে মুসলিম সেনাদলের চিন্তা।' যেদিন নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ হয়, সাইয়েদুনা উমর রা. মুসলিমদের চিন্তায় সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছিলেন।[১৪]

কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিমরা পারসিকদের মুখোমুখি হলে উমর রা. অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন। চাতক পাখির মতো সুদূরে তাকিয়ে থাকতেন। কোনো অশ্বারোহীকে আসতে দেখলেই তাকে জিজ্ঞাসা করতেন মুসলিম সেনাদলের কথা।[১৫]

প্রজাসাধারণের খোঁজ রাখতেন গুরুত্বের সঙ্গে। গভর্নরদের দূত এলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা। আবু মুসা আশআরি রা.-এর পক্ষ থেকে কাসেদ এলে উমর রা. তার কাছেও জানতে চেয়েছিলেন প্রজাদের খবরাখবর।[১৬]

জীবনের শেষ দিকে তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ড ঘুরে দেখবেন। জানতে চেষ্টা করবেন জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা। তিনি বলতেন, 'টানা এক বছর সফর করব। প্রজারা তো আমার কাছে আসতে পারে না, গভর্নরগণও অনেক সময় তাদের প্রয়োজনের কথা আমাকে জানায় না। দুই মাস থাকব শামে, দুই মাস জাযিরায়, দুই মাস মিসরে, দুই মাস বাহরাইনে, দুই মাস কুফায় এবং দুই মাস থাকব বসরাতে।' কিন্তু একমাত্র শামে যাওয়ারই তার তাওফিক হয়েছিল। ইচ্ছা থাকলেও অন্য কোথাও যেতে পারেননি।[১৭]

সদকা হিসেবে পশু এলে সেগুলোর দেখাশোনা তিনি নিজেই করতেন। একদিনের ঘটনা। মদিনায় চলছিল তপ্ত লু-হাওয়া। জমিন যেন আগুন উদ্‌গিরণ করছিল। মরুর বুক চিরে বের হচ্ছিল আগুনের ফুলকি। এমন পরিবেশে উসমান রা. দেখেন উমর রা. কয়েকটি উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এমন আবহাওয়ায় ঘর থেকে বের হয়েছেন কেন?' সাইয়েদুনা উমর রা. উত্তর দেন, 'সদকার দুটি উট দড়ি–ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা করলাম, সেগুলোকে ধরে রাখালের কাছে দিয়ে আসি।'

---

[১৪] তারিখে তাবারি, পৃষ্ঠা : ২৬২৮

[১৫] তারিখে তাবারি, পৃষ্ঠা : ২৩৬৭

[১৬] মুওয়াত্তা মালেক : ২৯৮৬ বিচার অধ্যায়, মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গ।

[১৭] তারিখে তাবারি, পৃষ্ঠা : ২৭৩৮

একদিন সদকা হিসেবে কিছু উট এলে সাথে-সাথে তিনি মাথায় চাদর দেন। উত্তপ্ত রোদে দাঁড়িয়ে সাইয়েদুনা আলি রা.-কে বলেন উটের হুলিয়া রেজিস্ট্রি করে রাখতে। উসমান রা.-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আলি রা.-কে তিনি বলেন, 'শুয়াইব আ.-এর মেয়ে মুসা আ.-কে বলেছিলেন, 'যাকে আপনি কর্মচারী হিসেবে রেখেছেন, তিনি একইসাথে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।' আমরা তো দেখছি সেই শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত মানুষটি আমাদের খলিফা— উমর ইবনে খাত্তাব।'[১৮]

তিনি একদিন সদকার উটের গায়ে তেল মেখে দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে বলে, 'আমিরুল মুমিনিন, একজন গোলাম দিয়েও তো এ কাজ করাতে পারতেন।' সাইয়েদুনা উমর রা. সেদিন উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে? মনে রেখো, যে ব্যক্তি মুসলমানদের অভিভাবক, প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমানদের গোলাম।'[১৯]

তিনি গুরুত্বসহ বাজার মনিটরিং করতেন। এ দায়িত্ব পালনে আবদুল্লাহ এবং সায়িব ইবনে জায়েদ নিয়োজিত থাকলেও তিনি নিজেই বাজারে যেতেন। সব ঠিকঠাক চলছে কি না, ঘুরে ঘুরে তা তদারকি করতেন।[২০]

একদিন তিনি বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন, আতেব রা.-কে দেখেন একেবারে অল্পদামে শুকনো কিসমিস বিক্রি করছেন। (বাজারের ভারসাম্য নষ্ট হবে বিধায়) সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'হয় তোমার পণ্যের দাম বাজারমূল্য নির্ধারিত করো, নয়তো এখান থেকে চলে যাও।'[২১]

বাইতুল মাল থেকে সাধারণ মুসলমানদের জন্য যে ভাতা নির্ধারণ ছিল, তিনি নিজে তাদের ঘরে গিয়ে সেগুলো বিতরণ করতেন। হিশাম কাবি বর্ণনা করেন, সাইয়েদুনা উমর রা. রেজিস্টার খাতা নিজের হাতে নিয়ে খুজাআ গোত্রে যেতেন। সেখান থেকে যেতেন কদিমা গোত্রে; কবিলায় থাকা সব বয়সের নারীদের ভাতা দিতেন নিজের তত্ত্বাবধানে। এরপর যেতেন আফফান নামক স্থানে। সেখানেও আপন হাতে ভাতা বিতরণ করতেন প্রাপ্যদের মাঝে।[২২]

---

[১৮] উসদুল গাবাহ, তাজকিরাতু উমর ইবনে খাত্তাব রা.।

[১৯] কানজুল উম্মাল : ১৪৩০৭

[২০] মুওয়াত্তা মালেক : কিতাবুল জাকাত (৭৩৯)

[২১] মুসনাদে আহমাদ : ১/২১

[২২] ফুতুহুল বুলদান : ৪৫৭